بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৯ মে, ২০২৫ মোতাবেক ০৯ হিজরত, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মুতার যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত আছে। এর বিশদ বিবরণ হলো, হযরত অওফ বিন মালেক আশজায়ী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি সেসব লোকের সফরসঙ্গী ছিলাম যারা হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-র সাথে বের হয়েছিলেন। আমার সাথে ইয়েমেনের একজন লোকের দেখা হয়, তার কাছে শুধু একটি তরবারি ছিল। একজন মুসলমান একটি উট জবাই করে। সেই (ইয়েমেনি) লোকটি তার কাছে কিছু চামড়া চাইলে সে তাকে তা দিয়ে দেয়। [উটের চামড়া চেয়েছিল।] সে তা ঢালের মতো বানিয়ে নেয়। এরপর তিনি বলেন, আমরা যাত্রা করি এবং রোমান সেনাদের সাথে আমাদের সংঘর্ষ হয়। তাদের মধ্যে একজন সৈন্য ছিল যে বাদামি রঙের ঘোড়ায় আরোহিত ছিল। তাতে সোনালি জিন ও সোনালি অস্ত্র ছিল। সেই রোমান সেনা মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ দিতে থাকে। সেই ইয়েমেনি লোকটি একটি পাথরের আড়াল থেকে তার দিকে এগিয়ে যায়। শত্রুর ঘোড়ার পায়ের রগ কেটে দেয়, [যুদ্ধ হয়;] রোমান (সৈনিক) ভূপাতিত হয়। সে তরবারি নিয়ে তার ওপর চেপে বসে এবং তাকে হত্যা করে। মুসলমান (সৈনিক) তাকে হত্যা করে এবং তার ঘোড়া ও অস্ত্র নিয়ে নেয়। আল্লাহ্ তা'লা যখন মুসলমানদের বিজয় দান করেন তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) সেই ব্যক্তির কাছে বার্তা পাঠান, [অর্থাৎ যিনি রোমান সৈনিককে হত্যা করেছিলেন তাকে ডেকে পাঠান] আর তার কাছ থেকে কিছু সামগ্রী নিয়ে নেন। অর্থাৎ বলেন, তুমি সামগ্রীগুলো ফেরত দাও। হযরত অওফ (রা.) বলেন, আমি হযরত খালিদ (রা.)-র কাছে গিয়ে বলি, 'আপনি কি জানেন, আল্লাহ্ তা'লা (যুদ্ধলব্ধ) সামগ্রী সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন?' খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) অল্প কিছুদিন পূর্বেই মুসলমান হয়েছিলেন; তাই তার ধারণা ছিল, হয়ত তিনি জানেন না যে, আল্লাহ্ তা'লা কী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তা হলো, সেই সামগ্রী হত্যাকারীর জন্য হবে; অর্থাৎ যে শত্রুকে হত্যা করেছে, সেই শত্রুর জিনিসপত্র ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তার কাছেই থাকবে। খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) বলেন, 'জি, আমি জানি, কিন্তু আমি (সম্পদের পরিমাণ) এর চেয়ে বেশি মনে করেছিলাম।' [যে সামগ্রী সে নিয়েছে তা তার প্রাপ্য অংশের চেয়ে বেশি ছিল।] তিনি (রা.) বলেন, আমি তাকে বললাম, 'এই সামগ্রী ঐ ব্যক্তিকে ফেরত দিন, অন্যথায় আমি এ বিষয়টি মহানবী (সা.)-কে অবহিত করব।' হযরত খালিদ (রা.) সামগ্রী ফেরত দিতে অস্বীকার করেন। হযরত অওফ (রা.) বলেন, এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। আমি সেই ব্যক্তির ঘটনা তুলে ধরি এবং হযরত খালিদ (রা.)-র আচরণের কথাও অবহিত করি। মহানবী (সা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কী করেছ?' তিনি নিবেদন করেন, 'আমি একে অনেক বেশি সামগ্রী মনে করে কিছু অংশ নিয়ে নিয়েছিলাম।' তিনি (সা.) বলেন, 'তার কাছ থেকে তুমি যা কিছু নিয়েছ, তা তাকে ফেরত দাও।' হযরত অওফ (রা.) বলেন, আমি বললাম, 'খালিদ, এখন নাও দেখি তার কাছ থেকে!' অর্থাৎ এখন তুমি এখন তুমি আর রাখতে পারবে না, মহানবী (সা.) সিদ্ধান্ত

দিয়ে দিয়েছেন। আমি কি তোমাকে বলি নি, এটা ফেরত দাও? যাহোক, যখন হযরত অওফ (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে এই কথা বলছিলেন, তখন মহানবী (সা.) তা শুনতে পান। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, 'কী হয়েছে?' তিনি (রা.) বলেন, আমি আবার পুরো ঘটনা বর্ণনা করি। পূর্বে সবকথা বলেন নি; এবার বলেন যে, আমি তাকে এটা ফেরত দিতে বলেছিলাম, কিন্তু তিনি তা করেন নি। তখন মহানবী (সা.) অসন্তুষ্ট হন। তিনি (সা.) আবার বলেন, 'খালিদ! তাকে জিনিসপত্র ফেরত দিও না।' [প্রথমে তিনি (সা.) সামগ্রী ফেরত দিতে বলেছিলেন, কিন্তু এখন তিনিই তা করতে নিষেধ করেন।] তারপর মহানবী (সা.) তরবিয়তের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা কি আমার মনোনীত আমীরদের এমন অবস্থায় ছেড়ে দিতে চাও যে, তোমাদের জন্য থাকবে যুদ্ধের কৃতিত্ব আর তাদের জন্য থাকবে অপযশ বা অপখ্যাতি? যখন কেউ নেতা হয়, তখন (তাকে ডিঙিয়ে) তোমাদের সিদ্ধান্তকে সঠিক আখ্যা দেওয়া এবং তোমাদের এরূপ আকাঙ্ক্ষা করা যে, এর কৃতিত্ব তোমাদের ভাগে আসুক, আর যদি এর কোনো মন্দ দিক থাকে এর জন্য নেতারা দায়ী হবে– এটি ভ্রান্ত রীতি। তুমি যেহেতু আমাকে পুরো বিষয়টি অবহিত করেছ তাই আমি আমার আগের আদেশ প্রত্যাহার করছি এবং খালিদ যা করেছে তা ঠিক করেছে।'

এখানে আমীর বা নেতার সম্মান প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য ছিল, তাই তিনি (সা.) বলেন, এভাবে তুমি আমীরকে তির্যক কথায় জর্জরিত করছ যে, 'তুমি আগে ভুল করেছ!' এ কারণে তিনি (সা.) তাঁর প্রথম সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন।

হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মুতার যুদ্ধে কিছু মুসলমান শহীদ হন। মুসলমানরা মুশরিকদের (সম্পদের) কিছু অংশ মালে গনিমত হিসেবে লাভ করেন। এসব সামগ্রীর মধ্যে একটি আংটিও ছিল। একজন সেটি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করেন। আমি তাকে বলি, সেই আংটিটি মহানবী (সা.) আমাকে দান করেছেন। হযরত খুযাইমা বিন সাবিত (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। রোমানদের মধ্যে একজন আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানালে আমি তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেই। সে একটি শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিল যাতে ইয়াকূত বা চুনি পাথর লাগানো ছিল। আমার লক্ষ্য ছিল সেই চুনি পাথরগুলো হস্তগত করা; আমি সেগুলো হস্তগত করি। আমি যখন মহানবী (সা.) সমীপে উপস্থিত হই, তখন আমি তাঁর সামনে চুনি পাথরগুলো উপস্থাপন করি। তিনি (সা.) সেগুলো আমাকে উপহারস্বরূপ দান করেন।' তিনি (রা.) বলেন, **'আমি হযরত উসমান গনী (রা.)-র যুগে এগুলো এক হাজার দিনারে বিক্রি করি (এবং) আমি তা দিয়ে একটি খেজুর বাগান ক্রয় করি।'** আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন, এসব রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয়, মুসলমানরা মালে গনিমতও লাভ করেছিলেন; পরাজয় বরণ করেন নি বরং (বিজয় লাভের পর) মালে গনিমত লাভ করেছিলেন। পরাজয়ের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এটা ছিল একটি সামরিক কৌশল যা তারা অবলম্বন করেছিলেন, যে কারণে তারা ফিরে এসেছিলেন। যাহোক, তিনি বলেন, তারা তাদের (তথা শত্রুদের) নেতাদের থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাদের নেতাদের হত্যা করেছিলেন।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) বর্ণনা করেন, **'মুতার (যুদ্ধের) দিন আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙেছিল এবং শুধুমাত্র একটি ইয়েমেনি চওড়া তরবারিই আমার হাতে রয়ে গিয়েছিল।'** আল্লামা মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বলেন, 'এই রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, মুসলমানরা মুশরিকদের ব্যাপকহারে হত্যা করেছিলেন, নতুবা তারা মুশরিকদের হাত থেকে রেহাই পেতেন না। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার, অপরদিকে মুশরিকদের সংখ্যা

ছিল দুই লক্ষাধিক। এটিই মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের একমাত্র সুদৃঢ় প্রমাণ, (বাকি) আল্লাহ্ই ভালো জানেন।' ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হযরত কুতবা বিন কাতাদা (রা.) মুসলমান বাহিনীর ডান বাহুর নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি মালেক বিন রাফেলাকে আক্রমণ করেন, যে খ্রিষ্টান বেদুইনদের নেতা ছিল। তিনি (রা.) তাকে হত্যা করেন। হযরত কুতবা (রা.) এ নিয়ে গর্বভরে আরবী পঙক্তিতে বলতেন, 'আমি রাফেলা বিন ইরাশের পুত্রকে এমনভাবে বর্শা দিয়ে আঘাত করি যা তার দেহের গভীরে প্রবেশ করেছিল, এরপর সেই বর্শাটি ভেঙে যায়। যখন আমি তার গ্রীবায় মোক্ষম আঘাত করি, তখন সে ঝুঁকে পড়ে– যেভাবে সালম (কাঁটাযুক্ত) গাছের কাণ্ড ঝুঁকে পড়ে। আমরা তার চাচাতো ভাইদের স্ত্রীদের সেভাবে হাঁকিয়েছি যেভাবে পশু হাঁকানো হয়।' হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা.) বর্ণনা করেন, যেদিন হযরত জা'ফর (রা.) এবং তার সাথিরা শহীদ হন, সেদিন মহানবী (সা.) আমাদের বাড়িতে আসেন। তিনি (সা.) বলেন, 'আমার কাছে জা'ফরের ছেলেদের নিয়ে আসো।' আমি তাদেরকে তাঁর সামনে উপস্থাপন করি। তিনি (সা.) তাদেরকে জড়িয়ে ধরেন, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু বইতে আরম্ভ করে। আমি নিবেদন করি, 'হে আল্লাহ্র রসূল (সা.), আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত! আপনি কেন কাঁদছেন? আপনি কি হযরত জা'ফর এবং তার সাথিদের ব্যাপারে কোনো খবর পেয়েছেন?' তিনি (সা.) বলেন, 'হ্যাঁ, আজ তাদের মাথায় শাহাদাতের মুকুট পরানো হয়েছে।' তিনি বলেন, আমি উঠে কাঁদতে লাগলাম। মহিলারা আমার কাছে জড়ো হয়ে যায়। মহানবী (সা.) নিজের পরিবারের কাছে গিয়ে বলেন, 'জা'ফরের পরিবারের প্রতি উদাসীন হয়ো না, তাদের জন্য কিছু খাবার বানাও। আজ তার স্বামীর মৃত্যুতে সে দুঃখ-ভারাক্রান্ত।' অর্থাৎ লোকদেরকে নির্দেশ দিলেন, আজ তাদের বাড়িতে খাবার পাঠিয়ে দিও।

হযরত আনাস বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) নিজের মিম্বরে আসেন এবং হযরত যায়েদ, হযরত জা'ফর ও ইবনে রাওয়াহার শাহাদাতের খবর দেন। তারা সেই দিনই শহীদ হয়েছিলেন, যদিও বাহ্যত তাদের শাহাদাতের সংবাদ আসে নি। তিনি (সা.) বলেন, 'এখন হযরত যায়েদ ইসলামের পতাকা তুলে নিয়েছেন। [অর্থাৎ তিনি (সা.) ঘটনাটি বর্ণনা করেন।] তিনি শহীদ হয়ে যান; তখন হযরত জা'ফর ইসলামের পতাকা তুলে নেন, তিনিও শহীদ হয়ে যান। তারপর ইসলামের পতাকা হযরত আবদুল্লাহ্ হাতে নেন, তিনিও শহীদ হয়ে যান।' তাঁর (সা.) চোখ থেকে তখন অশ্রু ঝরছিল; 'তখন ইসলামের পতাকা আল্লাহ্ তা'লার তরবারিসমূহের মধ্য থেকে একটি তরবারি ধারণ করল। (এরপর) আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বিজয় দান করলেন।'

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইয়ালা বিন উমাইয়া মুতাবাসীদের খবর নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) বলেন, 'তুমি যদি চাও তাহলে তুমি আমাকে বলো, আর তুমি চাইলে আমি তোমাকে তাদের ব্যাপারে বলে দিচ্ছি।' অর্থাৎ মহানবী (সা.) বলেন, আমাকেও আল্লাহ্ তা'লা খবর দিয়ে দিয়েছেন; তুমি আগে বলতে চাও নাকি আমি তোমাকে বলব যে, কী হয়েছে? তিনি নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি আমাকে বলে দিন।' তিনি (সা.) তাঁকে সমগ্র ঘটনা বলে দেন। তিনি নিবেদন করেন, 'সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে (সা.) সত্যসহ পাঠিয়েছেন! আপনি (সা.) ঐসব ঘটনা থেকে একটি শব্দও বাদ দেন নি।' তিনি (সা.) বলেন, 'আল্লাহ্ আমার জন্য ভূমিকে উঁচু করে দিয়েছিলেন, এমনকি আমি তাদের যুদ্ধক্ষেত্র দেখেছি। আমি স্বপ্নে তাদেরকে দেখেছি, তারা সোনার বিছানায় ছিল। আমি হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহার বিছানা দেখলাম, তার

বিছানায় কিছুটা বাঁকাভাব ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কী? আমাকে বলা হলো, এই দুইজন সোজাসুজি গিয়েছিলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ্ কিছুটা দ্বিধা করেছিলেন, তারপর এগিয়ে গিয়েছিলেন।' তার দ্বিধার উল্লেখ পূর্বের খুতবায় করা হয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, প্রথমে আমি যুদ্ধ করব না বলে ভেবেছিলাম।

একটি বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, জা'ফর, যায়েদ এবং ইবনে রাওয়াহাকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল, তারা মুক্তার তাঁবুতে ছিল। আমি হযরত যায়েদ এবং হযরত ইবনে রাওয়াহাকে দেখলাম, তাদের ঘাড়ে বাঁকাভাব ছিল, কিন্তু হযরত জা'ফর সোজা ছিলেন, তার মধ্যে কোনো বাঁকাভাব ছিল না। আমাকে বলা হলো, যখন এই দুইজনের ওপর মৃত্যু আসে তখন তারা এটি এড়াতে চেয়েছিলেন; অর্থাৎ এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু হযরত জা'ফর এরূপ করেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে বাহুর বদলে দুটি ডানা দান করেছেন, তিনি সেগুলোর মাধ্যমে জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যান।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর হযরত জা'ফরের পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে সালাম করার সময় বলতেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া ইবনা যিল জানাহাইন। অর্থাৎ হে দুই ডানাওয়ালার পুত্র! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি বিস্তারিত বিবরণে কিছু মাসলা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

যেসব কঠিন মাসলা রয়েছে, সেগুলো কিছু লোক বুঝতে পারে আর কিছু লোক বুঝে না। অন্যান্য লোক যারা অবগত থাকে, তাদের উচিত তাদেরকে সেই মাসলাগুলো বুঝিয়ে দেওয়া। তারা হয়ত নিজেরা চিন্তাভাবনা না করার কারণে বুঝে না, অথবা এই কারণে বুঝে না যে, তাদের অন্তর কোনো গুনাহের কারণে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে না। এই কঠিন বিষয়গুলো সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমত, জ্ঞানগত বিষয় যা সূক্ষ্ম দর্শনভিত্তিক হয়ে থাকে। যেমন তওহীদ; এর এতটুকু অংশ তো প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্ এক। কিন্তু এরপর এই সুফিসুলভ সূক্ষ্মতা যে, কীভাবে মানুষের প্রতিটি কাজে আল্লাহ্ তা'লার তাওহীদের প্রভাব পড়ে– এর জন্য একজন আরেফ তথা তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির প্রয়োজন হবে এবং এই মাসলাগুলো অন্যদের বোঝানোর জন্য কোনো আলেমের প্রয়োজন হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি এসব সূক্ষ্মতা বুঝে না, কিন্তু এতটুকু অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, কুরআন করীম অন্য কোনো খোদার ধারণাকে সমর্থন করে না। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, আল্লাহ্ এক।

দ্বিতীয়ত, এই সমস্যাগুলো এমন দাবি সম্পর্কে উদ্ভূত হয় যা জ্ঞানগত না হলেও এমন ভাষায় বর্ণিত হয় যাকে উপমা ও রূপক বলে। এগুলো সূক্ষ্ম কোনো জ্ঞানগর্ভ মাসলা নয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্যাংশ এবং প্রবাদ আছে যা লোকেরা বুঝতে পারে না; সেগুলো যদি ব্যাখ্যা করা হয় তবে কিছু লোক তার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করে নেয়। সাধারণ মানুষ সেই ভাষা না জানার কারণে এর এমন অর্থ করে নেয় যা বাস্তবতার ভিত্তিতে হয় না। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী (সা.)-এর সময়ে একটি ঘটনা ঘটেছিল। যখন সিরিয়ার যুদ্ধে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যদি যায়েদ নিহত হন তবে জা'ফর বিন আবি তালেব নেতৃত্ব নেবেন, আর যদি জা'ফর নিহত হন তবে আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা নেতৃত্ব নেবেন। মহানবী (সা.) যেমনটি বলেছিলেন, ঠিক তেমনটিই ঘটেছিল এবং হযরত যায়েদ, হযরত জা'ফর এবং হযরত আবদুল্লাহ্ তিনজনই শহীদ হয়ে যান। আর হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ সেনাবাহিনীকে নিজের নেতৃত্বে নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন। যখন মদীনায় এই সংবাদ পৌঁছে, তখন যেসব মহিলার স্বামী নিহত

হয়েছিলেন বা যেসব পিতামাতার সন্তান এই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, তারা শরীয়তের অনুমোদিত সীমায় থেকে ক্রন্দন আরম্ভ করে। মহানবী (সা.) শুধু সমবেদনা প্রকাশের জন্য বলেছিলেন, 'জা'ফরের জন্য তো কাঁদার কেউ নেই!' তিনি মোটেও এই উদ্দেশ্যে বলেন নি যে, মহিলারা একত্রিত হয়ে ক্রন্দন আরম্ভ করবে। জা'ফর তাঁর (সা.) আত্মীয় ছিলেন, তাই তিনি দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মতে এই বাক্যাংশ দ্বারা তাঁর এই উদ্দেশ্য কখনোই ছিল না যে, জা'ফরের জন্য কেউ ক্রন্দন বা বিলাপ করুক। বরং এটি বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, আমাদের ভাইও তো এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে; যখন আমরা কাঁদি নি, তখন তোমাদেরও ধৈর্য ধারণ করা উচিত; তিনি (সা.) এটাই বোঝাতে চাইছিলেন। কারণ হযরত জা'ফরের আত্মীয় হয় মহানবী (সা.) ছিলেন অথবা হযরত আলী ছিলেন, এবং তাঁদের মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের পক্ষে আর্তনাদ করা সম্ভব ছিল না। আল্লাহ্র রসূল (সা.) কিংবা হযরত আলী কারো পক্ষেই চিৎকার করা সম্ভব ছিল না। তাঁদের জ্ঞান ছিল, সঠিক উপলব্ধি ছিল। আমার ভাই জা'ফরও নিহত হয়েছে, কিন্তু আমি কাঁদি নি– এই কথাটা প্রকাশ করার জন্যই সম্ভবত মহানবী (সা.) বলেছিলেন, 'জা'ফরের জন্য তো কেউ কাঁদছে না!' আনসার যেহেতু মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি কথা পূরণ করার অত্যধিক আগ্রহ রাখতেন, তাই এই কথা শুনে নিজেদের ঘরে গিয়ে মহিলাদের বলেন, 'এখানে কান্নাকাটি করা বাদ দাও এবং জা'ফরের ঘরে গিয়ে বিলাপ করো।' অতঃপর যখন সব মহিলা হযরত জা'ফরের ঘরে একত্রিত হয়ে যায় এবং সবাই একসাথে বিলাপ করে ওঠে তখন মহানবী (সা.) এই আওয়াজ শুনে জিজ্ঞেস করেন, 'কী হয়েছে?' আনসার নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি যেহেতু বলেছিলেন, জা'ফরের জন্য কাঁদার কেউ নেই; তাই আমরা আমাদের মহিলাদের হযরত জা'ফরের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি এবং তারা কাঁদছে।' তিনি (সা.) বলেন, 'আমার কথার অর্থ তো এটা ছিল না! যাও, তাদের নিষেধ করো। আমার (কথার) উদ্দেশ্য ছিল, আমরা কাঁদি নি, তাই তোমরাও ধৈর্য ধারণ করো।' অতএব একজন লোক যায় এবং তাদের নিষেধ করে। মহিলারা সেই ব্যক্তিকে বলে, 'তুমি আমাদেরকে বারণ করার কে? মহানবী (সা.) তো আজ পরিতাপের সাথে বলেছেন, জা'ফরের জন্য তো কাঁদার কেউ নেই! আর তুমি আমাদেরকে কান্না করতে নিষেধ করছো?' তাদের এই উত্তর শুনে সে পুনরায় মহানবী (সা.)-এর নিকট যায়। কেননা কোনো কোনো মানুষের মাঝে সামান্য কথাও পৌঁছানোর অতিশয় আগ্রহ থাকে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তারা যখন এ কথা বলে তখন সে দ্রুত মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে নিবেদন করে, 'তারা আমার কথা মানছে না।' তখন মহানবী (সা.) বলেন, 'তাদের মাথায় মাটি ঢেলে দাও।' এটি একটি প্রবাদ। এ কথার অর্থ হলো, বাদ দাও, তাদেরকে আর কিছু বলো না; তারা নিজেরাই কান্নাকাটি করে চুপ হয়ে যাবে। (আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন,) সে নিজের চাদরে মাটি নিয়ে সেই কথাকে আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ করতে থাকে আর সেই মহিলাদের মাথায় মাটি দিতে শুরু করে। তখন তারা তাকে বলে, 'এই পাগল! করছ কী?' তখন সে বলে, 'মহানবী (সা.) আমাকে তোমাদের মাথায় মাটি ঢালতে বলেছেন, তাই আমি তো মাটি দিয়েই ছাড়ব!' এটি একটি রূপক কথা ছিল, সে এই কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে বাস্তবায়ন করতে আরম্ভ করে। হযরত আয়েশা (রা.) যখন একথা জানতে পারেন তখন তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং বলেন, 'তুমি তো কথা বুঝতেই পারো নি! মহানবী (সা.)-এর এ কথার অর্থ হলো, তাদেরকে উপেক্ষা করো, তারা নিজেরাই চুপ হয়ে যাবে। তাঁর কথার উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, তুমি তাদের ওপর মাটি ঢালতে আরম্ভ করবে।' অতএব এটি মহানবী (সা.)-এর একটি রূপক কথা ছিল, কিন্তু সে

আক্ষরিক অর্থেই মাটি দিতে শুরু করে দেয়। সুতরাং অনেক সময় লোকেরা রূপক কথা বুঝার চেষ্টা করে না। এখন এখানে দেখুন, একজন পুরুষ হয়েও সে এই কথাটি বুঝতে পারে নি, কেননা তার মধ্যে এতটা বুদ্ধি ছিল না। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) তাকে এটি বুঝালেন। এভাবে অনেক সময় কথার আক্ষরিক অর্থ করা বাস্তবতা পরিপন্থি হয়ে থাকে আর এভাবে কথা অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়ে যায়।

এই ঘটনা থেকে মহানবী (সা.)-এর প্রতি সাহাবীদের ভালোবাসার বিষয়টিও প্রকাশ পায়, যেটিকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) উক্ত ঘটনা উল্লেখ করে অন্যত্র এভাবে বর্ণনা করেছেন:

সাহাবীরা যে বিলাপ করার জন্য নিজ স্ত্রীদের হযরত জা'ফর (রা.)-র বাড়িতে পাঠালেন– এই ঘটনার মাধ্যমে সাহাবীদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি যে ভালোবাসা ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাঁর উক্তি তাদেরকে এই কথা ভাবার অবকাশ দেয় নি যে, মহানবী (সা.) আসলে কি চাইছেন; বরং তারা দ্রুত তাদের স্ত্রীদের বললেন, নিজেদের দুঃখ ভুলে গিয়ে তোমরা মহানবী (সা.)-এর সমব্যথী হও। এই ঘটনা দ্বারা তোমরা অনুধাবন করতে পারবে, তাদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি কতটা ভালোবাসা ছিল! অর্থাৎ 'জা'ফরের ঘর থেকে তো কোনো কান্নার শব্দ আসছে না'– মহানবী (সা.)-এর এই কথা শোনামাত্র তারা ভাবেন, নিজেদের আত্মীয়স্বজনের শাহাদাতের জন্য কান্না করে তারা ভুল করেছেন; প্রকৃত দুঃখ তো সেটিই যে দুঃখ পেয়েছেন স্বয়ং মহানবী (সা.)।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, বাহ্যত এটি একটি ছোটো ঘটনা মনে হতে পারে, কিন্তু অনুভূতি প্রকাশের দিক থেকে এর চেয়ে ভালো উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যাবে। এরা ছিলেন সেসব লোক যাদের সেবাসমূহ সরাসরি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সামনে ছিল। তাদের কুরবানী ও আত্মত্যাগ মহানবী (সা.)-এর চোখের সামনে সবসময় বিরাজমান থাকত। আর তারা এমন ভালোবাসা মহানবী (সা.)-এর প্রতি পোষণ করতেন, যার দৃষ্টান্ত জাগতিক কোনো সম্পর্কে খুঁজে পাওয়া যায় না।

অতএব যদি পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, যদি আবেগ-অনুভূতির দিক থেকে বিবেচনা করা হয়, তবে মহানবী (সা.)-এর উচিত ছিল তাদের অনুভূতির অধিক কদর করা এবং আমরা যারা বহু যুগ পরে এই দুনিয়ায় এসেছি, তাদের তুলনায় আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা কম হবার কথা। কারণ আমরা তো একেবারে পরবর্তী যুগের মানুষ। আমাদের প্রতি ভালোবাসা তো খুবই কম হওয়ার কথা ছিল। তারা তো সর্বদা মহানবী (সা.)-এর সম্মুখেই থাকতেন এবং ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] কিন্তু মুহাম্মদ (সা.)-এর অসীম ভালোবাসা– মানবীয় ভালোবাসার জন্য যতটা অসীম হওয়া সম্ভব– তা কখনোই এমন পরিস্থিতি উদ্ভব হতে দেয় নি, যার ফলে তোমাদের মনোবল হারিয়ে যেতে পারে। তিনি তোমাদের মনোবল কখনো হ্রাস পাবার সুযোগ দেন নি। অর্থাৎ এ যুগে আমরা যারা আছি, আমাদের মনোবলকে দুর্বল হতে দেন নি। বরং মহানবী (সা.)-এর মমতা ও ভালোবাসা এটিও পছন্দ করে নি যে, সেই মধ্যবর্তী (যুগের) উম্মতের মনোবলও ক্ষুণ্ন হবে। যেমন, এক বৈঠকে তিনি (সা.) পরবর্তীতে আগমনকারীদের উল্লেখ এই ভাষায় করেছেন, আমার ভাইয়েরা যারা আমার পরে আসবে, তারা এমন হবে। সাহাবীরা এটি শুনে ঈর্ষান্বিত হন। তারা নিবেদন করেন, তারা আপনার ভাই, আমরা কি আপনার ভাই নই? আমরা আপনার সাথে থাকি! আপনি আমাদেরকে ভাই বলেন নি, আর যারা পরবর্তীতে আগমন করবেন তাদেরকে আপনি নিজের ভাই বলছেন! মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা

আমার সাহাবী আর তারা আমার ভাই। তোমাদের জন্য কি এটি সামান্য কোনো নেয়ামত যে, তোমরা আমাকে দেখছ এবং আমার সাথে থেকে ধর্মের কাজ করছ! এটি অনেক বড়ো নেয়ামত যা তোমরা লাভ করেছ। আর পরবর্তীতে আগমন করার ফলে যারা আমাকে দেখবে না এবং যারা আমার পরে আগমন করবে– তাদের সম্পর্কেও তো আমাকে কিছু কথা বলতে দাও! তাদের সম্পর্কে কী বাক্য ব্যবহার করব যেন তারাও আশ্বস্ত হতে পারে আর তাদের মনোবলও দৃঢ় হয়। এভাবে তিনি (সা.) পরবর্তীতে আগমনকারীদের মনোবল দৃঢ় করেছেন। অতএব দেখো, মহানবী (সা.) কীভাবে তোমাদের মনোবল বৃদ্ধি করেছেন! তিনি (সা.) বলেছেন, আমি জানি না, আমার উম্মতের প্রথমাংশ শ্রেষ্ঠ নাকি শেষাংশ শ্রেষ্ঠ।

মুতার শহীদদের সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাসীরের গ্রন্থ 'বিদায়া ওয়া নিহায়া'তে আরো কিছু বর্ণনা এসেছে। মুতার শহীদদের সম্পর্কে উল্লেখ করার পর (তিনি) লিখেছেন, সেই শহীদদের সংখ্যা ছিল বারো। কতক রেওয়ায়েতে শহীদদের সংখ্যা আরো বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে যা-ই হোক, এটি অনেক বড়ো নিদর্শন যে, দুটি সৈন্যদল মুখোমুখি হয়েছে; যারা খোদার পথে লড়াই করছে সেই পক্ষের সংখ্যা তিন হাজার আর বিরোধী পক্ষের সৈন্য সংখ্যা দুই লক্ষ; এক লক্ষ রোমান আর এক লক্ষ খ্রিষ্টান। তারা পরস্পর রণাঙ্গণে মুখোমুখি হলো। তবুও মুসলমানদের শুধুমাত্র বারোজন সদস্য শহীদ হয়েছেন বা অনেক কম সংখ্যক সদস্য শহীদ হয়েছেন আর মুশরিকদের বৃহৎ সংখ্যক জাহান্নামে পৌঁছেছে। হযরত খালিদ (রা.) বলেন, (শুধুমাত্র) একা আমার হাতেই সেদিন নয়টি তরবারি ভেঙেছে। একটি ইয়েমেনি তরবারি ছিল যেটি আমার হাতে অক্ষত থাকে। সেসব তরবারির মাধ্যমে কতগুলো মুশরিক জাহান্নামে পৌঁছে থাকবে!

মুসলমানদের মদীনায় প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে এবং মহানবী (সা.)-এর তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর বিষয়ে লিখিত আছে, মুসলমানরা প্রত্যাবর্তনকালে এক জনপদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন যেখানে একটি দুর্গ ছিল। (মুতার যুদ্ধে) যাবার সময় এখানকার বাসিন্দারা একজন মুসলমানকে শহীদ করে দিয়েছিল। মুসলমানরা তাদের অবরোধ করেন, পরিশেষে তারা তা জয় করেন। হযরত খালিদ (রা.) তাদের সর্দারদের হত্যা করেন। মুসলমানরা যখন মুতা থেকে ফিরে আসেন তখন মহানবী (সা.) এবং সাহাবীরা তাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানান। তারা ফিরে আসলে কতিপয় মানুষ (সৈন্যদলের) প্রতি ভীষণ ক্রোধান্বিত ছিল যে, তারা শহীদ হয়ে কেন ফিরল না! এটি তো কোনো বিজয় হলো না। কতিপয় মানুষ সেনাদলের ওপর মাটি নিক্ষেপ করে বলতে লাগল, ওহে পলায়নকারীরা! তোমরা আল্লাহ্র পথ ছেড়ে পালিয়ে এসেছ। অর্থাৎ তাদেরকে বিদ্রূপ করে। এতে মহানবী (সা.) বলেন, **এরা পলায়নকারী নয়, বরং পুনঃ পুনঃ আক্রমণকারী,** অর্থাৎ ফিরে গিয়ে আক্রমণকারী। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মুসলমানরা যখন মুতা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আমিও তাদের সাথে ছিলাম। অপর এক রেওয়ায়েতে তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা লজ্জিত ছিলাম যে, আমরা পলায়নের পথ অবলম্বন করেছি। আমাদের এটি ধারণা ছিল, আমরা সেই (স্থান) ত্যাগ করে চলে এসেছি। অথচ শত্রুরা তো সেখান থেকে নিজেরাই পিছু হটে গিয়েছিল। তারা তাদের পিছু ধাওয়া করেন নি, বরং তারা এটিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করেন এবং ফেরত চলে আসেন। এটি বেশ ভালো বুদ্ধিবৃত্তিপূর্ণ কাজ ছিল, কিন্তু এটিকে কিছু মানুষ পলায়ন জ্ঞান করেছে। তিনি বলেন, আমরা একথা ভেবে লজ্জিত ছিলাম যে, আমরা পালানোর পথ অবলম্বন করেছি। আমরা বললাম, আমরা যদি মদীনায় চলে আসি তাহলে আমাদেরকে হত্যা করা হবে। তাই আমরা রাতের বেলায় মদীনায় প্রবেশ

করে আত্মগোপনে চলে যাই। কিছু মানুষ এতটাই লজ্জিত ছিল যে, রাতে প্রবেশ করে এবং লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি বলেন, আমরা ভাবলাম, আমরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তিনি (সা.) যদি তওবা কবুল করেন তো ভালো, অন্যথায় আমরা চলে যাব। অর্থাৎ পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে চলে যাব অথবা সেখান থেকে চলে যাব। আমরা ফজরের নামাযের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর সকাশে হাজির হই। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কে? আমরা উত্তরে বলি, পলায়নকারীরা। তারা নিজেরাই লজ্জিত ছিলেন, তাই নিজেরাই বলেন, যারা সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে– আমরাই তারা। তিনি (সা.) বলেন, না, তোমরা তো পালটা আক্রমণকারী দল, আমিও তোমাদের দলে। অথবা তিনি (সা.) বলেন, আমি সব মুসলমানের দলভুক্ত। এটি শুনে আমরা তাঁর (সা.) হাত চুম্বন করি। মহানবী (সা.) অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ আচরণ করেন।

এরপর আরেকটি যুদ্ধাভিযান রয়েছে যা হযরত আমর বিন আস-এর অভিযান নামে অভিহিত। এ যুদ্ধাভিযান ৮ম হিজরীর জমাদিউস সানী মাসে সংঘটিত হয়। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, এ যুদ্ধাভিযান ৭ম হিজরীতে হয়েছিল। ইবনে ইসহাক ছাড়া বাকি সবাই এ বিষয়ে একমত যে, এ যুদ্ধাভিযান মুতার যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছিল আর মুতার যুদ্ধ ৮ম হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধাভিযানের কারণ ছিল, মহানবী (সা.) সংবাদ পান, বনু কুযাআর একটি দল মদীনার আশেপাশে আক্রমণের উদ্দেশ্যে একত্রিত হচ্ছে। বনু কুযাআ ছিল কাতানীয়দের একটি গোত্র, মদীনা থেকে দশ দিনের দূরত্বে আল-কুরা উপত্যকা পেরিয়ে যাদের অবস্থান ছিল।

এ সম্বন্ধে আরো বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) তাদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে হযরত আমর বিন আস (রা.)-কে প্রেরণ করেন। হযরত আমর বিন আস মক্কার একজন সর্দার আস বিন ওয়ায়েল-এর পুত্র। তিনি এক বর্ণনামতে ৭ম হিজরীতে এবং আরেক বর্ণনামতে ৮ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আমর বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে কাপড়চোপড় এবং অস্ত্রশস্ত্র গুছিয়ে নেবার জন্য বার্তা পাঠান। আর তিনি (সা.) বলেন, হে আমর! আমি তোমাকে একটি সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করতে চাই যাদেরকে আল্লাহ্ গনিমতও দান করবেন এবং তোমাদের সুরক্ষাও করবেন। হযরত আমর নিবেদন করেন, আমি ধনসম্পদের লালসায় তো ইসলাম গ্রহণ করি নি। মহানবী (সা.) বলেন, পুণ্যবান মানুষের জন্য হালাল ধনসম্পদ কত-না উত্তম! তুমি এজন্য ইসলাম গ্রহণ করো নি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যদি সম্পদ দান করেন তবে তা অনেক উত্তম। মহানবী (সা.) হযরত আমর (রা.)-র নেতৃত্বে মুহাজির ও আনসারের সমন্বয়ে তিনশ সেনা প্রস্তুত করেন যাদের মাঝে ৩০জন অশ্বারোহী ছিলেন। তিনি (সা.) হযরত আমর (রা.)-র জন্য একটি সাদা রঙের পতাকা বাঁধেন এবং সেই সাথে একটি কালো রঙের পতাকাও প্রদান করেন। মহানবী (সা.) হযরত আমরকে উপদেশ প্রদান করে বলেন, পথিমধ্যে বনু বালী উযরা বালকায়ন-এর কেউ যদি তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে তাকে যেন নিজেদের সাথে নেবার চেষ্টা করেন। হযরত আমর যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ পারঙ্গমতা রাখতেন এবং রণকৌশলেও তার নৈপুণ্য ছিল। মহানবী (সা.) তাকে তার যুদ্ধ-পারঙ্গমতার কারণে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত আমর (রা.)-কে এই যুদ্ধাভিযানে প্রেরণের একটি কারণ হলো, তার দাদি বালী গোত্রের সদস্যা ছিলেন, তাই বনু বালীর সাথে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তিনি একটি উত্তম মাধ্যম হতে পারতেন। ইসলামী সৈন্যবাহিনী যাত্রা আরম্ভ করল। এরা রাতে সফর করত এবং দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকত। ইত্যবসরে তারা জুযাম গোত্রে অবস্থিত সালাসিল নামক ঝরনার নিকটে পৌঁছে যান। এই

ঝরনার কারণে এ যুদ্ধাভিযানকে 'সারিয়্যা যাতে সালাসিল'-ও বলা হয়। মদীনা থেকে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলমানরা যখন ঝরনার নিকটে পৌঁছায় তখন জানতে পারে, শত্রুদের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি। হযরত আমর (রা.) অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য হযরত রাফে বিন মাকীসকে মহানবী (সা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আবু উবায়দা বিন জাররাহর জন্য একটি পতাকা তৈরি করেন এবং দু-শো মুহাজির ও আনসারের একটি সৈন্যদল তার সাথে প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-ও তাদের সাথে ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে প্রেরণ করার সময় নসীহত করে বলেন, সেখানে পৌঁছে তোমরা হযরত আমরের সাথে যুক্ত হয়ে ঐক্যবদ্ধ বাহিনী গঠন করবে এবং নিজেদের মাঝে কোনো ধরনের মতবিরোধ তৈরি করবে না। এর উদ্দেশ্য ছিল যেন দুই দল একতাবদ্ধ থাকে এবং নিজেদের মাঝে যেন কোনো মতবিরোধ তৈরি না করে। আর হযরত আমর (রা.) তাদের নেতৃত্ব প্রদান করবেন।

এর বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা আছে, একবার মুসলমানরা আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠ জড়ো করেন যেন তারা শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য আগুনের তাপ গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু হযরত আমর (রা.) তা করতে বারণ করেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত আমর (রা.) যখন আগুন জ্বালাতে নিষেধ করেন তখন হযরত উমর (রা.) খুবই রাগান্বিত হন এবং তার (রা.) কাছে যেতে চান, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তাকে থামিয়ে দেন এবং বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার রণনৈপুণ্যের কারণে তাকে আমীর বানিয়েছেন। হযরত আমর (রা.) যখন ফিরে আসেন তখন তিনি মহানবী (সা.)-কে বলেন, আমি আগুন জ্বালানো অপছন্দ করার কারণ হলো, শত্রুরা আমাদের স্বল্প সংখ্যা দেখতে পেয়ে যেন অতিরিক্ত সৈন্যদল নিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ করে না বসে। মহানবী (সা.) তখন তার (রা.) এই বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেন।

যাহোক, বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে, মুসলমানরা সেখান থেকে যাত্রা করে শত্রুদের অঞ্চলে পৌঁছে তাদেরকে পদদলিত করে এবং তাদের ওপর বিজয় লাভ করে। মুসলমানরা যখন সেই স্থানে পৌঁছায় যেখানে শত্রুদের জড়ো হবার সংবাদ ছিল, শত্রুরা সেসময় মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে পালিয়ে যায় এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে শত্রুপক্ষের একটি ছোটো দলের সাথে তাদের লড়াই হয়। মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে পরাভূত করে আর বাকিরা পালিয়ে যায়। মুসলমানরা কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন আর যেখানেই শত্রুদের কোনো দলের অবস্থানের সংবাদ শুনতে পেতেন সেখানেই অশ্বারোহীদের প্রেরণ করতেন আর তারা তাদের (তথা শত্রুদের) মোকাবিলা করত এবং তাদের উট, ছাগল ইত্যাদি নিয়ে ফেরত আসত। মুসলমানরা মদীনায় ফেরত আসার জন্য রওয়ানা হয়। হযরত আমর (রা.) হযরত অওফ বিন মালেক আশজায়ী (রা.)-কে মহানবী (সা.)-এর নিকট আগে প্রেরণ করেন যেন তিনি মহানবী (সা.)-কে তাদের নিরাপদে ফিরে আসা এবং যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করতে পারেন।

আরেকটি যুদ্ধাভিযানের নাম হলো হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ। ৮ম হিজরীর রজব মাসে এই যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়েছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এমএ (রা.) তার পুস্তকের শেষাংশে যেসব শিরোনাম প্রস্তাব করেছেন সে অনুযায়ী ৮ম হিজরীর ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-র এই যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধাভিযানের অন্যান্য নামও রয়েছে। একে 'সারিয়্যা সীফুল বাহর' এবং

‘সারিয়্যা খাবাত’-ও বলা হয়। সীফুল বাহর অর্থ সমুদ্র উপকূল। এই যুদ্ধাভিযানে যেহেতু সাহাবীরা লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থান করেছিলেন সেজন্য এই যুদ্ধাভিযানকে সীফুল বাহর বলা হয়। একে ‘সারিয়্যা খাবাত’ অর্থাৎ ‘পাতা খাওয়ার অভিযান’ বলা হয়, কেননা এ যুদ্ধে এমন একটি মুহূর্ত এসেছিল যখন সাহাবীরা গাছের পাতা খেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই অভিযানটির নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)। মহানবী (সা.) তাঁকে ৩০০জন মুহাজির ও আনসার সাহাবীর একটি দলসহ বনু জুহাইনার একটি শাখার দিকে পাঠিয়েছিলেন। এই অভিযানে হযরত উমর (রা.)-ও অংশগ্রহণ করেছিলেন। বনু জুহাইনা নামক গোত্রটি ‘কাবালিয়া’ নামক স্থানে বসবাস করত। এই স্থানটি মদীনা থেকে প্রায় পাঁচ রাতের দূরত্বে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এই অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, মক্কার কুরাইশের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা, যেটি শস্য নিয়ে সিরিয়া থেকে সমুদ্রের পাশ ঘেঁষে মক্কা যাচ্ছিল, তার উপর জুহাইনা গোত্রের পক্ষ থেকে হামলার আশঙ্কা ছিল।

এটি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়কার ঘটনা। যেহেতু জুহাইনা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মিত্র, তাই তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে সতর্কতামূলকভাবে একটি নিরাপত্তা দল পাঠিয়ে দেন যেন সিরিয়া থেকে আগত কাফেলার ওপর কোনো হামলা না হয় এবং কুরাইশের হাতে চুক্তি লঙ্ঘনের অজুহাত না আসে। এই বাহিনী পাঠানো হয়েছিল কুরাইশের কাফেলাকে নিরাপত্তা দেবার জন্য, যেন পথিমধ্যে বসবাসরত কোনো গোত্র আক্রমণ করে না বসে। কারণ হুদাইবিয়ার চুক্তি হয়ে গিয়েছিল এবং এই নতুন চুক্তি অনুযায়ী সকলের তা মেনে চলা আবশ্যক ছিল। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা.) ৩০০জনের একটি দল পাঠালেন যেন তারা কুরাইশ কাফেলাকে নিরাপদে পথ অতিক্রমে সহায়তা করে।

এ থেকে স্পষ্ট হয়, এই সাহাবীরা কারো সাথে যুদ্ধ করতে যান নি। তাই ১৫ দিনেরও বেশি সময় অবস্থান করা সত্ত্বেও কোনো যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এই অভিযানে রওয়ানা হওয়া এবং রাস্তায় খাবার শেষ হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে একটি বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। হযরত জাবের (রা.) এই অভিযানের বিষয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের পাঠিয়েছিলেন। আমরা ছিলাম ৩০০জন আরোহী এবং আমাদের নেতা ছিলেন হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)। আমরা রওয়ানা হলাম এবং কিছুদূর যেতেই আমাদের খাবার পাথেয় শেষ হয়ে গেল। তখন হযরত আবু উবায়দা যার কাছে যা খাবার ছিল সব একত্র করার নির্দেশ দেন। একত্র করার পর দেখা গেল, আমাদের কাছে মাত্র দুই থলে খেজুর রয়েছে। হযরত আবু উবায়দা আমাদের প্রতিদিন অল্প অল্প করে খেজুর খেতে দিতেন, অবশেষে তা-ও শেষ হয়ে গেল। এরপর আমাদের প্রতিদিন মাত্র একটি খেজুর করে দেওয়া হতো।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত জাবেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, একটি খেজুরে কীভাবে তোমাদের ক্ষুধা মিটতো? তিনি বলেন, যখন সেটিও পাওয়া বন্ধ হলো, তখনই বুঝতে পারলাম একটিমাত্র খেজুরও কত মূল্যবান ছিল। [একসময় যখন আমাদের কাছে আর কিছুই থাকল না, তখন সেই একটি খেজুরই আমাদের কাছে অমূল্য মনে হতে লাগল।] আরেক বর্ণনামতে, হযরত জাবের বলেন, আমরা সারাদিন সেই একটি খেজুর চুষে চুষে খেতাম, তারপর পানি পান করতাম। রাত পর্যন্ত সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত।

হযরত জাবের বলেন, আমরা কুরাইশের বাণিজ্য কাফেলার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে অবস্থান করি। আমরা প্রায় আধা মাস সেখানে ছিলাম এবং চরম ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম। এমনকি আমরা গাছের পাতা পর্যন্ত খেয়েছি। এই কারণে এই

বাহিনীর নাম রাখা হয় 'জাইশুল-খাবাত' অর্থাৎ 'পাতা ভক্ষণকারী বাহিনী'। আমাদের এই খাদ্যাভ্যাসের কারণে আমরা এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে, আমাদের ঠোঁট ও মুখের চারপাশে ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি এক ব্যক্তি বলেছিল, যদি এই অবস্থায় শত্রুর সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হতো, তবে এই দুর্দশার কারণে যুদ্ধ তো দূরের কথা, আমরা নড়াচড়াও করতে পারতাম না!

খাদ্যের জন্য উট জবাইয়ের বিষয়েও একটি উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত জাবের বলেন, আমাদের বাহিনীতে একজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সবাইকে খাওয়ানোর জন্য তিন দিন তিনটি উট জবাই করেন। এরপর হযরত আবু উবায়দা তাকে তা বন্ধ করতে বলেন। সীরাত বিষয়ক গ্রন্থাবলি থেকে জানা যায়, এই ব্যক্তি ছিলেন হযরত কায়েস বিন সা'দ। হযরত কায়েস বিন সা'দ বলেন, কে আমার কাছে খেজুরের বিনিময়ে উট বিক্রি করবে? উট আমি এখানেই জবাই করব, কিন্তু এর দাম মদীনায় ফিরে গিয়ে পরিশোধ করব। অর্থাৎ সাহাবীদের ক্ষুধার তীব্রতা দেখে তিনি বলেন, আমি উট ক্রয় করব এবং এখানে জবাই করে তোমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করব। হযরত উমর (রা.) উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলেন, এই ছেলে বড়োই অদ্ভুত! তার নিজের কাছে তো কোনো সম্পদ নাই, আবার অন্যের সম্পদের বিষয়ে নাক গলায়। বাড়িতে গিয়ে কীভাবে দাম দেবে? এর কাছে নিজের তো কোনো বাগান নেই। হযরত কায়েসের সাথে জুহাইনার এক ব্যক্তির দেখা হয়। তিনি (রা.) সেই ব্যক্তিকে বলেন, আমার কাছে উট বিক্রি করো। সেখানকার গোত্র থেকে তিনি একটি উট ক্রয় করে বলেন, আমি মদীনায় গিয়ে খেজুর দিয়ে এর মূল্য পরিশোধ করে দেবো। সেই ব্যক্তি বলেন, তুমি কে? আমি তো তোমাকে চিনি না। হযরত কায়েস বলেন, আমি কায়েস বিন সা'দ বিন উবায়দা। লোকটি বলল, তুমি তোমার বংশ পরিচয় দিয়ে আমাকে চিনিয়ে দিলে। আমার ও মদীনার নেতা সা'দের মধ্যে তো বন্ধুত্ব রয়েছে; আমরা পরস্পর বন্ধু। হযরত কায়েস তার থেকে পাঁচ ওয়াসাক খেজুরের বিনিময়ে পাঁচটি উট ক্রয় করেন, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাতশ কিলোগ্রাম খেজুরের বিনিময়ে। সেই ব্যক্তি বলল, তুমি সাক্ষী আনো। [কোনো জামিনদারও তো থাকা উচিত।] তখন কয়েকজন মুহাজির ও আনসারী সাহাবী তার পক্ষে সাক্ষী হয়ে যান। হযরত উমর এ মর্মে সাক্ষী হতে অস্বীকৃতি জানান যে, এই সম্পদ তো তার নিজের না, বরং তার পিতার। অর্থাৎ যে খেজুরের কথা সে বলছে, সেই খেজুরের বাগান তার পিতার; সে কীভাবে দাম দেবে? যাহোক, এই সেনাবাহিনী যখন মদীনা ফেরত আসে তখন হযরত সা'দ হযরত কায়েসকে জিজ্ঞেস করেন, সাহাবীরা যখন ক্ষুধার্ত ছিল তখন তুমি কী করেছ? তিনি বলেন, আমি উট জবাই করেছিলাম। হযরত সা'দ বলেন, এরপর কী করেছ? হযরত কায়েস বলেন, এরপর আমি আবারও উট জবাই করি। হযরত সা'দ পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, এরপর কী করেছ? হযরত কায়েস বলেন, এরপর আমি আবারও উট জবাই করি। হযরত সা'দ জিজ্ঞেস করেন, এরপর কী করেছ? হযরত কায়েস বলেন, এরপর আমাকে নিষেধ করা হয়। হযরত সা'দ জিজ্ঞেস করেন, কে নিষেধ করেছিল? হযরত কায়েস বলেন, হযরত আবু উবায়দা (রা.)! হযরত সা'দ পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, কেন নিষেধ করেছিল? হযরত কায়েস বলেন, কারণ আমার কোনো সম্পদ নাই, বরং যা আছে তা আমার বাবার। হযরত সা'দ বলেন, আমি তোমাকে চারটি বাগান দিচ্ছি। [তার পিতা এতে খুশি হন। তিনি বলেন, আমি তোমাকে চারটি বাগান দিয়ে দিচ্ছি।] এর মাঝে সবথেকে নিম্নমানের বাগান থেকেও তুমি কমপক্ষে পঞ্চাশ ওয়াসাক খেজুর পাবে। [অর্থাৎ বিপুল পরিমাণ, কয়েকশ কিলোগ্রাম খেজুর।] হযরত সা'দ একটি দলিল লিখে দেন এবং এতে আবু উবায়দা (রা.)-সহ অন্যান্য ব্যক্তিদের

সাক্ষী রাখেন। বনু জুহাইনার সেই ব্যক্তিও কায়েসের সাথে মদীনা এসেছিল। হযরত সা'দ তাকে খেজুর দেন, বাহন দেন এবং কাপড় পরিধান করান। হযরত জাবের বলেন, মহানবী (সা.) যখন এই ঘটনা জানতে পারেন তখন তিনি (সা.) বলেন, দানশীলতা তো এই পরিবারের বংশগত ঐতিহ্য।

হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব এই ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন, সাহাবায়ে কেরামের কঠিন ক্ষুধার সময়েও অসীম ধৈর্য প্রদর্শন করা এবং কোনো কাফেলা বা জনপদের প্রতি খাদ্যের জন্য কোনো ধরনের বলপ্রয়োগ না করা একথার প্রমাণ বহন করে যে, এই অভিযানের উদ্দেশ্য কোনো যুদ্ধ ছিল না। আর তাদের পবিত্র আত্মা কোনো অন্যায় বা জুলুমকে বৈধ মনে করত না।

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা সেই সময়ে সেখানে তাদের ক্ষুধা মেটানোর জন্য একটি ব্যবস্থা করেছিলেন। এ সম্পর্কে লেখা আছে:

হযরত জাবের এই অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, সমুদ্র আমাদের জন্য একটি বড়ো টিলার ন্যায় মাছ যাকে আমবার বলা হয়, সমুদ্র থেকে বাহিরে নিক্ষেপ করে। এই আমবার অনেক বড়ো মাছ যাকে তিমি মাছও বলতে পারেন। আল্লামা আযহারী বলেন, আমবার সমুদ্রের অনেক বড়ো একটি মাছ, যার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত হয়ে থাকে। হযরত জাবের (রা.) বলেন, এর (অর্থাৎ তিমি মাছের) মাংস আমরা ১৫ দিন বা অপর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আঠারো দিন অথবা এক মাস পর্যন্ত খেয়েছি। সেখানে অবস্থান ও ফেরত আসার আগ পর্যন্ত আহার করেছি আর এর চর্বি শরীরের মালিশ করেছি, যার ফলে আমাদের শরীর আগের মতো সতেজ হয়ে যায়; ক্ষুধার কারণে (শারীরিক) যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তা দূর হয়ে যায়। হযরত জাবের (রা.) বলেন, সেই মাছের চোখ বড়ো বড়ো কলসির মতো ছিল। আমরা তা থেকে কয়েক কলসি তেল সংগ্রহ করেছি এবং তার দেহ বড়ো বড়ো টুকরো কেটেছি, কিছু অংশ বাজারে নিয়ে বিক্রিও করেছি। সেই মাছের চোখের কোটরের ভেতর বসার বিষয়ে দুই ধরনের রেওয়ায়েত বিদ্যমান। হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমরা মোট ছয়জন মাছের চোখে (অর্থাৎ চোখের কোটরে) বসেছিলাম, যদিও আরেক রেওয়ায়েতে ত্রিশ ব্যক্তির বসার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আবু উবায়দা বিন জার্রাহ্ (রা.) মাছের পাঁজরের একটি হাড় এবং অপর রেওয়ায়েত অনুযায়ী দুটি পাঁজরের হাড় নিয়ে দাঁড় করান এবং (আমাদের মধ্যে) সবচেয়ে লম্বা ব্যক্তি হযরত কায়েস (রা.)-কে সবচেয়ে উঁচু উটে বসিয়ে দেন আর তারা উভয়েই অনায়াসে এর পাঁজরের হাড়ের মধ্য দিয়ে হাড় স্পর্শ করা ছাড়াই পার হয়ে যান।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে লিখা রয়েছে, হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমরা যখন মদীনায় ফিরে এলাম তখন আমরা মহানবী (সা.)-এর নিকট সেই মাছের গল্প শোনালাম। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছেন তা থেকে আহার করো, আর তোমাদের কাছে যদি কিছু রয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমাকেও খাওয়ার জন্য দাও। তাদের মধ্য থেকে কেউ একজন তাঁকে (সা.) অল্প একটু দিলে তিনি (সা.) তা খেয়ে নেন।

এই যুদ্ধের বিবরণ এখানে শেষ হচ্ছে। আমার চেষ্টা ছিল এটি দ্রুত শেষ করার যেন অন্য (নতুন) বিষয়বস্তু (নিয়ে আলোচনা) আরম্ভ করা যায়। কিন্তু কতক জানাযা ও শহীদদের স্মৃতিচারণের বিষয়ও মাঝে মাঝে আসতে থাকে। এখনো এর কিছুটা অংশ বাকি রয়ে গেছে, সবশেষে মক্কা বিজয়ের আলোচনাও করা হবে। যাহোক, (যুদ্ধাভিযান নিয়ে) এই আলোচনা এখনো চলমান রয়েছে। কিন্তু আজ আমি এটিও উল্লেখ করতে চাই, গত শুক্রবারও আমি

বলেছিলাম, পাকিস্তান ও ভারতের মাঝে বিরাজমান যুদ্ধের পরিস্থিতি সামনে রেখে অনেক বেশি দোয়া করুন যেন তাদের মাঝে পারস্পরিক সমঝোতা ও মীমাংসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কারণ বর্তমানে যুদ্ধে যে-সকল সমরাস্ত্র ব্যবহৃত হয় তার ফলে সাধারণ নাগরিকরাও নিহত হয়, আর যুদ্ধের পরিস্থিতি নতুন মোড় নেওয়ায় সাধারণ নাগরিক নিহত হচ্ছে। অতএব, (আমাদের) দোয়া করা উচিত যেন উভয় পক্ষ সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং বড়ো ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়।

এই প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টিও স্মরণ রাখা আবশ্যক, বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা ইন্টারনেটের অন্যান্য যে-সকল মাধ্যম রয়েছে, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া যা-ই রয়েছে, ক্ষুদেবার্তা ইত্যাদিতে প্রত্যেকে অত্যন্ত স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করে এবং নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী যা ইচ্ছা বলে বেড়ায়, যার ফলে লাভের তুলনায় ক্ষতিই বেশি হয়। খুব গর্বের সাথে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করে বসে। আহমদীদের এমন কাজ এড়িয়ে চলা উচিত। কেননা এরূপ অভিব্যক্তি প্রকাশে উপকারিতার তুলনায় ক্ষতি বেশি। যদি বার্তা প্রদানের অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তা প্রদান করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর জীবনের সর্বশেষ বার্তায়, অর্থাৎ তিনি যে 'পয়গামে সুলেহ্' পুস্তক লিখেছিলেন, তাতে তিনি এই শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তাই দিয়েছিলেন। তাই প্রত্যেক আহমদীর তা স্মরণ রাখা আবশ্যক এবং এর জন্য চেষ্টাপ্রচেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সকল নিরীহ মানুষের প্রাণহানি থেকে সকলকে রক্ষা করুন। কতক পরাশক্তি একে (তথা এই যুদ্ধকে) উসকে দেবার চেষ্টা করছে। তারা চায়, উভয় দেশ লড়ুক ও দুর্বল হয়ে যাক আর তাদের অস্ত্র বিক্রি হোক। আল্লাহ্ তা'লা তাদের অনিষ্ট থেকেও রক্ষা করুন। অনুরূপভাবে ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্যও সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন আর তারা যেন শান্তিতে নিজ দেশে বসবাস করতে পারে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, শান্তির কোনো সুযোগ নেই, বরং তাদেরকে এখান থেকে কোনোভাবে বের করে দেবার চেষ্টা চলছে আর এ কাজে সকল পরাশক্তি ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহকে বিবেকবুদ্ধি দান করুন যেন তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। তারা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় তবে অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। কতক দেশের এরূপ ধারণা করা ভুল, বিশ্বযুদ্ধ হলেও তারা নিরাপদ থাকবে। এটি সবাইকেই নিজের গ্রাসে পরিণত করবে।

সুতরাং এমন ভুল ধারণা সবার মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে রক্ষা করুন। যাহোক, আমি যেভাবে সবসময় বলে থাকি, এর একমাত্র সমাধান হলো আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অবনত হওয়া, আর এটিই একমাত্র উপায় যা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে। এটি ছাড়া (মুক্তির) আর কোনো উপায় নেই। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)